Vol. 45 | No. 3 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অতুলপ্রসাদের গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক

Volume	45
Issue	3
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শাহনাজ নাসরীন ইলা
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v45i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i3.7
Pages	152-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অতুলপ্রসাদের গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক

শাহনাজ নাসরীন ইলা*

বাংলা গানের বিকাশের ধারায় অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ নাম। কেবলমাত্র গীত-রচয়িতা হিসেবেই নয়— সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, সর্বোপরি যাবতীয় প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষক ও কর্ণধার হিসেবেই তিনি একজন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন। তাঁর গানের সংখ্যা মাত্র ২০৭টি। তাঁর সংগীত-সংকলন 'গীতিগুঞ্জ' পঞ্চম সংস্করণে এ গানগুলো সন্নিবেশিত আছে। এই স্বল্পসংখ্যক গানের মধ্য দিয়েই তাঁর স্বীয় প্রতিভা অতুল মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাঁর গানে প্রকাশিত হয়েছে ঈশ্বরভক্তি, প্রেম, মানবপ্রীতি, দেশপ্রেম, সমসাময়িক ঘটনা, প্রকৃতিপ্রেম সর্বোপরি অধ্যাত্ম সাধনার এক অনুপম জ্যোতির্ময়লোক। রবীন্দ্রনাথের মত অতুলপ্রসাদের মানসলোকেও সাধিত হয়েছিল ভাবয়িত্রী এবং কারয়িত্রী প্রতিভার এক অপূর্ব সমন্বয় এবং সংগতি।[১]

অতুলপ্রসাদ সেন ১৮৭১ সালের ২০শে অক্টোবর ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন ও মাতা হেমন্তশশী। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার প্রথম সন্তান এবং মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের প্রথম দৌহিত্র। রামপ্রসাদ পেশায় ডাক্তার এবং ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্নেহানুগ্রহে এবং অর্থানুকূল্যে তিনি ডাক্তারী পড়েন। তাঁদের আদি নিবাস মাদারীপুর জেলার মগর গ্রামে। রামপ্রসাদ ছিলেন কবি, গায়ক ও ভক্ত। প্রত্যহ প্রভাতে পিতার গান ও সংস্কৃত শ্লোক শুনে শিশু অতুলপ্রসাদ শয্যা ত্যাগ করতেন। সংস্কৃত ভাষা বোঝার বয়স তখনও তাঁর হয়নি কিন্তু তাঁর চিত্তকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছে এই সব শ্লোক। শৈশব থেকেই এই সব শ্লোক তাঁর মানসলোকে উপ্ত করেছে অধ্যাত্মসাধনার বীজ। দুর্ভাগ্যবশত বাল্যবয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। এরপর তিনি প্রতিপালিত হন মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের আশ্রয়ে।

---

* প্রভাষক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কালীনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, সদালাপী, সদানন্দ, ভগবদভক্ত, সর্বোপরি ভক্তিগীতি রচয়িতা ও গায়ক। প্রায়ই কালীনারায়ণ নগর সংকীর্তনে বের হতেন, অতুলপ্রসাদও এই সংকীর্তনে তার সংগী হতেন। ছেলেবেলায় কালীনারায়ণের সাহচর্য ও প্রেরণা অতুলপ্রসাদের জীবন-গঠনে ও মনন-বিকাশে ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। শৈশব থেকেই অতুলপ্রসাদ সংগীতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। নিজের বাড়ী, মাতামহের বাড়ী উভয়স্থানেই ছিল সংগীতের অনুকূল পরিবেশ। অতুলপ্রসাদের সংগীতপ্রীতি সম্পর্কে মানসী মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "ঢাকায় তখন নববিধান সমাজের নিজস্ব উপাসনা গৃহ ছিল না। রামপ্রসাদের মিরাতারের বাড়ীর দরজা সর্বদা উন্মুক্ত, অবারিত। প্রতি রোববার সেখানে উপাসনা সভা বসত এবং গান বাজনা হত। ঋষি কালীনারায়ণ যদিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন তবু ঐ উপাসনা সভায় নিয়মিত যোগদান করতেন। বালক অতুলপ্রসাদ ঐ উপাসনা সভায় উপস্থিত থাকতেন; গানবাজনা শুনতেন এবং নিজেও শোনাতেন। রামপ্রসাদ যখন ব্রহ্মসংগীত গাইতেন তখন বালক অতুলপ্রসাদ পিতার খোল নিয়ে তার গানের সংগে সংগত করতেন। তাঁর প্রয়াস দেখে মুগ্ধ রামপ্রসাদ তাকে একটি ছোট খোল কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু একটি বাজনাতেই অতুলপ্রসাদের সুরেলা মন তৃপ্ত ছিল না। ঐ বয়সেই তিনি হারমোনিয়াম, বেহালা, বাঁশী ইত্যাদি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।... সংগীত ছিল অতুলপ্রসাদের রক্তে, হৃদয়ে ও কণ্ঠে। ঠাকুরদা প্রায়ই নগরসংকীর্তনে বেরিয়ে পড়তেন। বালক অতুলপ্রসাদ তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন, ঠাকুর দাদার কীর্তনে সকলের সঙ্গে তিনিও দোহার দিতেন। কিছুক্ষণ পর দেখা যেত বালক অতুল মাতোয়ারা হয়ে মূল গায়েন হয়েছেন আর ঠাকুর দাদাসহ অন্য সকলে তাঁর সংগে দোহার দিচ্ছেন।"[২]

অতুলপ্রসাদ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ঐ সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুনা করতেন চিত্তরঞ্জন দাস, বিহারীলাল মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। তাঁর আশৈশব স্বপ্ন ছিল তিনি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হবেন। ১৮৯০ সালে অতুলপ্রসাদ ব্যারিস্টারী পড়ার উদ্দেশে বিলেত রওনা হলেন। বিলেতে অবস্থানকালে চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রী অরবিন্দ, মনোমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সরোজিনী নাইডু প্রমুখের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। প্রবাসে তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। প্রবাসে তিনি বেশ কিছু স্বদেশী সংগীত রচনা করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় কৃতকার্য হন এবং ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা প্রত্যাগমন করেন। কলকাতায় স্যার সত্যপ্রসন্ন সিংহের সহকারী হয়ে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর 'খামখেয়ালী' সভার সদস্য ছিলেন। সারাদিনের কাজ শেষে সাহিত্য, সংগীত ও নানা আলোচনার এই সভা তাঁর কাছে উপভোগ্য ছিল।

এই আসরেই সরলা দেবীর সহায়তায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে পরিচিত হন। 'খামখেয়ালী'র অন্য সদস্যরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, লোকেন পালিত, রাধিকামোহন গোস্বামী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আইন ব্যবসায় অসাফল্যের জন্য তিনি কিছুদিনের জন্য রংপুর শহরে প্রাকটিস করেন।

অতুলপ্রসাদ বিলেত বসবাস কালে বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সপরিবারে বিলেত যান। সেখানেই মামাতো বোন হেমকুসুমের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। হেমকুসুম স্বভাবে অত্যন্ত জেদী এবং গর্বিত মহিলা ছিলেন, তিনি ভাল গান গাইতেন এবং পিয়ানো-বেহালা বাজাতে পারতেন। পারিবারিক অনিচ্ছা ও সম্পর্কটি এদেশীয় আইনসিদ্ধ নয় বিধায় তাঁরা ১৯০০ সালে স্কটল্যান্ডের গ্রেটনাগ্রীন স্থানে বিবাহ করেন। অতুলপ্রসাদ সেখানেই নতুন করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০১ সালে তাঁদের যমজ সন্তান দিলীপকুমার ও নিলীপকুমার জন্মগ্রহণ করে। সাত মাস বয়সে একরকম বিনা চিকিৎসাতে নীলিপকুমারের মৃত্যু হয়। লন্ডনে আইন ব্যবসার কোন উন্নতি না হওয়ায় তিনি ১৯০২ সালে কলকাতা ফিরে আসেন। লন্ডনে অবস্থান কালে সুহৃদ ব্যারিস্টার মমতাজ হোসেন লক্ষ্ণৌতে তাঁকে আইন ব্যবসা করতে পরামর্শ দেন। তিনি তাঁকে লক্ষ্ণৌতে জীবিকায় ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ ও ভাষণ, অভিজাত শিষ্টাচার, সম্ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ তাঁকে পেশায় ও সমাজে সফল মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে। তিনি লক্ষ্ণৌতে উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। উর্দুসাহিত্যে ও উর্দুগজলে তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল এবং বাংলায় গজলগান রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে লক্ষ্ণৌতে উন্নয়নমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। বহির্জগতে যতই তাঁর খ্যাতি পরিচিতি ও অন্তরঙ্গতা বাড়তে থাকে পারিবারিক ও অন্তর্জীবনে ততোই হয়ে পড়েন বিড়ম্বিত ও নিঃসঙ্গ। এই সব পারিবারিক ও মানসিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মধ্যেই চলত অতুলপ্রসাদের সংগীত সৃষ্টির কাজ।[৩] শৈশব থেকেই অতুলপ্রসাদ ভক্তিসংগীতের পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন, যার সূত্রপাত হয়েছিল প্রাতঃকালে পিতার সংস্কৃত শ্লোক শ্রবণে ঘুম থেকে জাগরণের মাধ্যমে। এরপর মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের সাহচর্যে আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা, সার্বিক মানবিক চেতনার বিকাশ লাভ ঘটতে থাকে।

অতুলপ্রসাদের রচনার কালানুক্রমিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। কৈশোরে মামাতো বোন তাপসীর জন্মদিনের আশীর্বাদ-স্বরূপ রচিত কবিতাই তাঁর প্রথম রচনা হিসেবে স্বীকৃত। ব্যারিস্টারী পড়ার সূত্রে বিলেতে যাবার প্রাক্কালে রচনা করলেন বিখ্যাত সংগীত 'উঠ গো ভারত লক্ষ্মী'। বিলেত অবস্থানকালে ম্যাডাম প্যাটের কণ্ঠে Home sweet home গানটি শুনে রচনা করলেন 'প্রবাসী চলরে দেশে চল' গানটি। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাবের গৌরবে, ভাষার অপূর্ব স্বচ্ছতায় গানগুলি অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর গানে যে রসের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব

তাকে আরো সরস ও অতুলনীয় করে। তাঁর গানগুলি 'অতুলপ্রসাদের গান' নামে পরিচিত। অতুলপ্রসাদের গানগুলি কালানুক্রমিতায় সাজান নেই বলে তাঁর গানের ধারাবাহিক মানচিত্রটি আমরা পাই না। সুনীলময় ঘোষ সম্পাদিত 'অতুলপ্রসাদ সমগ্র' গ্রন্থে ২০৭টি গান অন্তর্ভুক্ত আছে। সাহানা দেবীর সম্পাদনায় ৭১টি গান স্বরলিপিসহ 'কাকলি' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। অপর গানগুলি 'গীতিগুঞ্জ' ও 'কয়েকটি গান' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সংখ্যার দিক থেকে অপ্রতুল হলেও তাঁর গানসমূহ বিষয়বৈচিত্র্যে অনন্য। প্রেম, পূজা, প্রকৃতি, স্বদেশ ও বিবিধ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গানগুলো বিন্যাস করা যায়।

প্রেম : অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানে মানব ও দেবতা প্রায়শই একই চৈতন্যভূমিতে মিলিত হয়েছে। তাঁর প্রেমের গানে প্রকাশিত হয়েছে কবির অন্তরের আনন্দ, বেদনা ও ভালোবাসার অমৃত। তাঁর এ পর্যায়ে গানগুলোর ভাষা মর্মস্পর্শী, চিত্তলোকে আবেগ সঞ্চার করে, হৃদয়ের যন্ত্রণাবোধ জাগ্রত করে। অতুলপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সংগীতে। তাঁর প্রেম পর্যায়ভুক্ত গানের সংখ্যা ৫৯টি। এ পর্যায়ভুক্ত অধিকাংশ গানের বিষয়বস্তু প্রিয়বিরহকাতরতা। হতাশা, নৈরাশ্য, না পাওয়ার বেদনা, গভীর একাকীত্ব তাঁর গানগুলোকে করে তুলেছে নিঃসঙ্গ, তাঁরই সুর গভীর আবেগ বেদনা নিবিড় অনুভবে অনুরণিত হয়েছে প্রতিটি গানে। কাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা/ আমি পথের ভিখারি নহি গো/ শুধু তোমারি দুয়ারে অন্ধের মত/ অন্তর পাতি রহিগো.../ সখা সঞ্চিত পাপপুণ্য/ দেখো সকলি করেছি শূন্য/ তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে তাই/ রিক্ত হৃদয় বহি গো প্রভৃতি তাঁর প্রেমপর্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বর্ষার নিদ্রাহীন রাতে দরিয়ার অতীত স্মৃতি রোমন্থন এবং সঙ্গপিয়াসী কবি বলেছেন- বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে/ আমিও একাকী, তুমিও একাকী/ আজি এ বাদল রাতে। বর্ষা চিরকাল বিরহের পটভূমি বিস্তার করেছে। 'গগনে বাদল নয়নে বাদল জীবনে বাদল ছাইয়া' এই কথাতে মনে হচ্ছে এ যেন সমস্ত জীবনের সঙ্গীহীন বিরহের নিবিড় অন্ধকার–অশ্রান্ত বর্ষণে প্রহর কেটে যাচ্ছে সমস্ত আকাশ ঝর ঝর করে যেন বলছে 'এসো হে আমার বাদলের বঁধু চাতকিনী আছে চাহিয়া'। এ গান প্রকৃতি পর্যায়ভুক্ত হলেও অসামঞ্জস্য হয় না। বিরহই অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানের মূল সুর, যার মধ্যে আছে আবেগের স্রোত, অনুনয়, বিলাপ, উচ্ছ্বাস। বর্ষার দমকা বাতাসে, বসন্তের মৃদু সমীরণে, অর্ধজাগরণ স্বপ্নাভাসে পুরাতন দিনের সহস্র স্মৃতি ভেসে আসে স্মৃতিলোক থেকে। তাঁর প্রেমের গানে প্রেম আছে প্রেমিকা নেই। যেমন– 'বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা/ আজ পড়িছে মনে মম কত কথা!.../ আজিকে মন চায় জানাতে তোমায়/ হৃদয়ে হৃদয়ে শত ব্যথা।'

অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানে আছে প্রিয়সঙ্গবিহীন করুণ আর্তি। ব্যক্তিজীবনে তিনি অসফল প্রণয় ভিক্ষু। মিলনাকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি তাঁর স্বপ্নেই মিলিয়ে যায়। তাই তাঁর গানে যৌবনের স্বপ্নবিলাস নেই, বেদনা আছে, নেই আন্দোলিত বায়ু হিল্লোলে

কামনার উল্লাস। রয়েছে নিঃশব্দময় দীর্ঘশ্বাস, কুলপ্লাবিত ধারাজল, বাদল রাতের তমসা আর বুকভরা এক রাশ অভিমান : 'কে গো গাহিলে পথে 'এসো পথে' বলিয়া?/ দুয়ার খুলিনু যবে কেন গেলে চলিয়া?' অথবা 'বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা?/ আজ পড়িছে মনে মম কত কথা'। এর চেয়েও সুরে বেজেছে অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানে বিষাদ বৈরাগ্য; অপরিতৃপ্ত প্রেমের জন্য বিষণ্ন বিলাপ, রমণীর রূপতৃষ্ণা, সৌন্দর্য পিপাসা ও হাহাকার। তবে ঐ সমস্ত অভাব অস্বস্তি অনির্বাণ জ্বালায় ধূমায়িত হলেও তাঁর গানের বাণী ভীষণ সুন্দর, স্নিগ্ধ এবং মধুর আবেদনে ভরা, যা চৈত্র বাতাসের মত বারবার হুহু করে ছুটে আসে অসম্ভব আকর্ষণে, বুদ্ধিদীপ্ত স্বকীয়তায়।[৪] তাঁর প্রেমের গানের বিশেষত্ব হল বিরহ বেদনার দুঃসহ অশ্রুস্রোত সেগুলিকে আগাগোড়া পূর্ণ করে রেখেছে। যে অন্তহীন শোক, বিরহের গভীর বিলাপ তাঁর জীবনকে বেষ্টন করে রেখেছিল, এ যেন সেই আত্মঅভিজ্ঞতার বাণীময় ও সুরময় আত্মপ্রকাশ।

পূজা : পূজা পর্যায়ভুক্ত গানের সংখ্যা ৫৪টি। অতুলপ্রসাদের গান বিনম্র মধুর আত্মনিবেদনের গান। ঈশ্বরের চরণে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছেন পরম নির্ভরতায়। বিপদে, সম্পদে তাঁকেই তিনি আঁকড়ে থেকেছেন পরমবন্ধু অসহায়ের সহায় রূপে। বলেছেন– 'কি আর চাহিব বলো, হে মোর প্রিয়/ তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো/ বলিব না রেখ সুখে, চাহ যদি রেখো দুখে/ তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিয়ো/ শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো। সাধনার পথ ধরে ঈশ্বরের সান্নিধ্য, করুণা লাভের আকুতি প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি গানে। সকল সুখে দুঃখে ঈশ্বরই অধীশ্বর বলে লিখেছেন- 'আমারে ভেঙে ভেঙে/ করো হে তোমার তরী/ যাতে হয় মনোমত/ তেমনি ক'রে লও হে গড়ি। অতুলপ্রসাদের ঈশ্বরজিজ্ঞাসা ছিল স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাঁর ধর্মানুভূতি ছিল নিবিড় ও অনুভবের বিষয়। এই অনুভূতির ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদ ধ্যানের দৃষ্টিতে যে ভূমার সাধনা করেছেন তাই তাঁর কবিধর্মের পরম অনুভূতি– 'যদি দুঃখের লাগিয়া গড়েছ আমায়/ সুখ আমি নাহি চাই/ শুধু আঁধারের মাঝে তব হাত দুটি/ খুঁজিয়া যেন গো পাই। ঈশ্বরের সাথে এত নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে তিনি সহজেই বলতে পারেন– 'সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া/ তুমি তো আমার রহিবে/ বহিবারে যদি নাহি পারি এ ভার/ তুমিতো, বন্ধু, সহিবে।'

এই পর্যায়ের গানগুলোতে মরমী আকুলতা অধিকাংশ স্থানে পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। অজানা, অচেনা, অসীমের প্রতি মানব মনের নিগূঢ় আকাংক্ষা, অবোধ হৃদয়ের চিরন্তন আরাধনা এই গানগুলোতে পরিস্ফুট হয়েছে। ব্যক্তিগত অসফল জীবনে সান্ত্বনার জন্য বলেছেন– 'আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে/ বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই/ দু'জন যদি হ'ত আপন/ হ'ত না মোর আপন সবাই।'

রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন মানুষের দুটি দিক। একদিকে সে বৈষয়িকতার সিদ্ধির জন্য জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য ব্যাপৃত। অন্যদিকে সে

বৈষয়িকতার ঊর্দ্ধে, ব্যক্তিগত তুচ্ছতার অতীত। মানুষের জীবনের সেই দ্বিতীয় দিকটিকেই অতুলপ্রসাদ তাঁর পূজার গানে গ্রহণ করেছেন।

প্রকৃতি : বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বারো মাসে ছয় ঋতুর যে পালাবদল চলেছে অতুলপ্রসাদের প্রকৃতি বিষয়ক গানে বঙ্গপ্রকৃতির সেই চিরন্তন মর্মবাণীই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কালের বিবর্তনে জীবনের চলমান স্রোতে ঋতুগুলি অতিথির মত আমাদের জীবনে উপস্থিত হয়। কবি এই চঞ্চল রূপ রস গন্ধে ভরা বৈচিত্র্যময় কালকে কাব্যে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির সংগে এই নন্দিত মিলন সাধনই অতুলপ্রসাদের প্রকৃতিবোধের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর এ পর্যায়ের গানের সংখ্যা ১৭টি। বাংলার ষড়ঋতুর লীলা-বৈচিত্র্য কবির মনকে স্বভাবতই আলোড়িত করেছে। গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত প্রকৃতির পালাচক্রে বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির পটভূমিতে তিনি গান রচনা করেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই বর্ষা ঋতু বাংলার কবি সাহিত্যিকদের কাছে একটি অত্যন্ত প্রিয় অনুষঙ্গ। মেঘ মেদুর বর্ষার নির্জনতা, একাকীত্ব, সিক্ত প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপ, যুঁথীর মোহময় সুগন্ধ, ঘন কালো মেঘ, নিবিড় বর্ষা, অঝোর ধারায় বর্ষণ, বিদ্যুৎ বারি, প্রিয়বিরহ কাতরতা ইত্যাদি বিষয় বার বার ফিরে ফিরে এসেছে গানে কবিতায়। প্রকৃতির এ গানগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, সূক্ষ্ম, আনন্দময়, কাব্যময় এবং সুনিপুণভাবে ছন্দোবদ্ধ। এমনি এক বরষার পটভূমিতে কবি লিখলেন- 'ঝরিছে ঝর-ঝর গরজে গর গর/ স্বনিছে সর সর শ্রাবণ মা/ তটিনী তর তর, সরসী ভর ভর/ ধরণী থর থর, সিতক গা/ বিরহী ধর ধর, মানিনী সর সর/ চাহিছে খর খর, সুলোচনা।' প্রকৃতিকে নায়ক করে লিখেছেন- 'প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল্‌লো বঁধু/ ঘোমটা খানি খোল্/ আছি আজ পরান মেলি দেখব বলি/ তোর নয়ন সুনিটোল লো বঁধু/ নয়ন সুনিটোল।' এই আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ গানখানি প্রকৃতি বিষয়ে গ্রন্থিত হলেও এটি দেবতা পর্যায়ভুক্ত হতে পারত। আবার প্রকৃতির পটভূমিতে মানব পর্যায়ভুক্ত প্রেম বিরহ কাতর, গভীর অনুভূতিসম্পন্ন গান সন্নিবেশিত রয়েছে। বর্ষা চিরকাল বিরহের পটভূমি বিস্তার করেছে। প্রেমবেদনার স্মৃতি উদ্রেক করেছে– 'বঁধু, এমন বাদলে তুমি কোথা?/ আজি পড়িছে মনে মম কত কথা।' আবার মেঘের আনাগোনায় কৌতূহলী, কৈশোরিক চপলতায় লিখেছেন- 'মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে/ ও আকাশ, বল আমারে।' প্রকৃতির তৃণে বিপিনে, পুষ্পে পল্লবে, বসন্তসমীরে জোৎস্নালোকে সকলের সংগে সুগভীর সর্বানুভূতি অনুভব করেছেন। প্রকৃতি প্রেমে মাতোয়ারা কবি ঘরে না ফেরার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন- 'যাব না, যাব না, যাব না ঘরে/ বাহির করেছে পাগল মোরে।' এ পর্যায়ের গানগুলোতে কখনও ঋতুর রূপচিত্র, কখনও ঋতুর পটভূমিকায় কোন গোপন মনের অসীম বিরহ বেদনা, কখনও উৎসবের মাঙ্গলিক ধ্বনি প্রকাশিত হয়েছে। বসন্তের বর্ণময় সম্ভাষণ এবং বসন্ত বন্দনায় উচ্ছ্বসিত কবি বলেছেন– 'আইল আজি বসন্ত মরি মরি/ কুসুমে রঞ্জিত কুমমঞ্জুরি/ অলি আনন্দিত নাচে গুঞ্জরি/ পিক পুলকিত গাহে কুহরি।'

স্বদেশ : উনিশ শতকের নবজাগরণের যুগে গীতিকবিদের রচনায় দেশাত্মবোধের সুগভীর অনুভব বিভিন্ন ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সব রচনার বিষয়বস্তু দেশের পরাধীনতার বেদনা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, অতীত ঐতিহ্য, মাতৃভাষাপ্রীতি, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান, আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠা, স্বদেশের প্রতি আনুগত্য, সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের আহ্বান প্রভৃতি। এই গীতধারা স্বদেশসংগীত, দেশাত্মবোধক গান, স্বদেশী গান প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করেছে। কৈশোরেই অতুলপ্রসাদের মননে দেশাত্মবোধের উন্মেষ দেখা যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর কাছে আদর্শ ব্যক্তিত্ব। ঢাকায় থাকাকালীন তিনি তাঁর সংস্পর্শে আসেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি দেশের কাজে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন। জাতীয় জাগরণের প্রেরণাতেই তিনি এ গানগুলো রচনা করেন। ১৮৯২ সালে বিলেত যাত্রার পথে ইতালীর ভেনিস নগরে গন্ডোলা চালকদের গানের সুরে নিজের দেশের পরাধীনতার বেদনা, হতাশা ভুলে উদ্দীপনার মন্ত্রে দেশবাসীকে সচেতন করতে দেশের প্রতি গভীর মমতায় লেখেন– 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদিজগত-জন-পূজ্যা/দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো, দূরিত ভারত-লজ্জা/ ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, কর সজ্জা/পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!' বিলেতে অবস্থান কালে তিনি শ্রী অরবিন্দ, মনমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সরোজিনী নাইডু, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ বরেণ্য রাজনীতিবিদ ও ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যে আসেন। প্রবাসে এঁদের সাহচর্যে মাঝে মাঝে সাহিত্যচর্চা, সংগীত বা বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা হত। বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের সংস্পর্শে তাঁর সুকুমার কবিচিত্তে যে জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ ঘটেছিল তারই প্রকাশ এ পর্যায়ের গানগুলো। বর্তমান অবস্থায় হতাশাগ্রস্ত না হয়ে অতীত গৌরব স্মরণ করে দেশবাসীকে নবোদ্যমে প্রেরণা জাগাতে রচনা করেছেন– 'বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে/ ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সম্মেলক গানের প্রয়োজনে তিনি এই গানখানি রচনা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সীতাপুরে 'আওয়ার ডে' ফান্ডের সাহায্যের জন্য মহামিলনের এই গানখানি তিনি রচনা করেন– 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর/ হও উন্নতশির-নাহি ভয়/ ভুলি' ভেদাভেদ-জ্ঞান হও সবে আগুয়ান/ সাথে আছে ভগবান-হবে জয়। মাতৃভাষাপ্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁর এ গানখানি– 'মোদের গরব, মোদের আশা/ আ মরি বাংলা ভাষা! মাতৃভাষার জন্য রচিত সবচেয়ে জনপ্রিয় এ গানটি কালের গণ্ডি অতিক্রম করে আজও সকল বাঙালীর মনে কালোত্তীর্ণ মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে তিনি সম্প্রদায়নিরপেক্ষ এ গানখানি রচনা করেন– 'দেখ্ মা এবার দুয়ার খুলে/ গলে গলে এনু মা তোর/ হিন্দু মুসলমান দু ছেলে।'

স্বদেশ পর্যায়ে রচিত অতুলপ্রসাদের স্বদেশসংগীতগুলো অনবদ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকাল থেকেই তিনি কয়েকটি জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন। তৎসম শব্দের সুমিত ব্যবহারে, মৃত্তিকা-ভূস্বর্গের ধ্যানমূর্তির চিত্র চেতনায়, চিরায়ত নিজ বাসভূমির ঐতিহ্য চারণে অতুলগীতির স্বদেশসংগীতগুলো অন্তরস্পর্শী।'[৫] দেশের অতীত গৌরব উপস্থাপনা, বর্তমান দুরবস্থায় খেদ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য উৎসাহ, মাতৃভাষাপ্রীতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি প্রচলিত বিষয় তাঁর গানে রূপায়ণ করেছিলেন। সাহস, নির্ভীকতা মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বিকাশে ও প্রকাশে বিশ্বাস, সত্য ন্যায় করুণার জয়ে বিশ্বাস, বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস এ পর্যায়ের গানগুলোর অন্তর্নিহিত ভাব। এ গানগুলোর সুর হয়ত বলিষ্ঠ নয়, কিন্তু দেশপ্রেমের একক আদর্শে অনুপ্রাণিত।

অতুলপ্রসাদের গান : আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য : অতুলপ্রসাদের শিল্প-সাধনা কাব্য ও সংগীতের মধ্য দিয়ে। অতুলপ্রসাদ শুধুমাত্র সুর রচয়িতা নন, তিনি একজন কবিও। তাঁর গানে কবিত্বের সঙ্গে সংগীতের সম্মিলন ঘটেছে। তাই তাকে গীতিকবি বলাই সংগত। আন্তরিক মনোভাবকে তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বের সাহায্যে তিনি সুন্দরভাবে মূর্ত করে তুলেছেন। অতুলপ্রসাদের গানের কথা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবি। সারা জীবনের অন্বেষা ও সংবেদনে বার বার এসেছে সন্দেহ, সংশয়, দোলাচল ও প্রশ্নমুখরতা। আদ্যন্ত তিনি ছিলেন বিশ্বাসী ও ভক্ত। এসব রচনায় তাঁর বুভুক্ষু, ভাবময় ও শরণাগত মনটি পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি সুরের দিক থেকে ঠুংরী, সাওয়ন, হোরী, কাজরী, চৈতী, লাউনী ইত্যাদির অনুসারী। জীবনের প্রায় অধিকাংশ সময় তিনি লক্ষ্মৌতে কাটান। তাই বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সুরের মিশ্রণ ঘটানো তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। সুর প্রয়োগে ঠুংরী ছিল অতুলপ্রসাদের মুখ্যপ্রেরণা। ঠুংরীর গায়ন কলাকে তিনি বাংলা কাব্য সংগীতের সংগে যুক্ত করেছিলেন। ঠুংরীর প্রতি গভীর আকর্ষণ সত্ত্বেও অতুলপ্রসাদ তাঁর গানকে সুর প্রয়োগে হিন্দুস্থানী সংগীতে পর্যবসিত করেননি। বাণীর গভীরতম আকুতি প্রকাশের বাহন করে তুলেছিলেন সুরকে। বাণীকে তিনি ঠুংরীর কোমল মাধুর্যময় গায়ন কলার সংগে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এই অর্থে হিন্দুস্থানীয় ঠুংরীর সংগে অতুলপ্রসাদের ঠুংরী ভঙ্গিম গানের পার্থক্য রয়েছে। 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে' গানটি সম্পর্কে বলেছেন– 'আমরা তাঁর বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে নামক বেহাগ গানটিতে যে রসটির পরিচয় পাই, তা এত করুণ মধুর হয়ে উঠেছে প্রধানত এই জন্য যে তার মধ্যে বাংলার কবিত্ব ও বৈষ্ণব কবির চিরন্তন বিরহ গানের সুরের সংগে খাঁটি হিন্দুস্থানী বেহাগের এক অপরূপ মিলন সাধন করা হয়েছে।[৬] ভাষার সাথে সুরের সুস্মিত প্রয়োগে গানের প্রাণকে চেনা যায়, তার ভাবটিকে ধরা যায়। অতুলপ্রসাদ উত্তরভারতীয় লোকসংগীতের সুরভঙ্গিতে বেশ কয়েকটি গান রচনা করেছেন। শ্রাবণ-ঝুলাতে বাদলরাতে (পিলু সাওয়ন), মধুকালে এল হোলি (কাফি হোলি), কে গো গাহিলে পথে 'এসো পথে' বলিয়া (লাউনী) জল

বলে চল, মোর সাথে চল (কাজরী), ঝরিছে ঝর ঝর (সাওয়ন) প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আবার কিছু কিছু রাজসংগীতের গানে বাউলের-কীর্তনের সুর মিশিয়ে দিয়েছেন। যেমন– মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে, আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কর হে তোমার তরী, যদি তোর হৃদযমুনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ওগো আমার নবীন শাখী ছিলে তুমি কোন বিমানে' সুন্দর করুণ এ গানটি বাউল কীর্তনের সঙ্গে হিন্দুস্থানী পিলুর রসে নির্মিত। এ গানে প্রেমের উচ্ছ্বাস নেই, আছে রিক্ত মনে নবপ্রেম সঞ্চারের আশংকা। 'সুগম্ভীর সুরকলা বা জটিল তাল বিন্যাস তাঁকে অনুপ্রাণিত করেনি। অতুলপ্রসাদের সংগীতাকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে সহজ, মধুর ও আকুলতা মিশ্রিত প্রকাশরীতিতে।[৭] বাংলায় গজল রচনার ক্ষেত্রেও অতুলপ্রসাদ পথিকৃৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নজরুলের পূর্বে তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম গজল শ্রেণীর গান রচনা করেন। কত গান তো হল গাওয়া, কে গো তুমি বিরহিণী অথবা ঝরিছে ঝর ঝর অতুলপ্রসাদ রচিত সুবিখ্যাত গজল গান।

উপসংহার : অতুলপ্রসাদ সেন হাজার বছরের বাংলা সংগীতের ধারায় গৌরবোজ্জ্বল কীর্তির পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি প্রেম, ভক্তি, ভাষাপ্রীতি, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক বহু গান রচনা করেন। তাঁর গান আমাদের সন্ধান দেয় পরমার্থলোকের, শ্রোতাকে নিয়ে যায় আপন চিত্তলোকে, পাঠককে শোনায় শাশ্বত বিরহের অফুরান বেদনার কথা। গানের বাণী ও সুর নিয়ে অতুলপ্রসাদ নানামাত্রিক পরীক্ষা করেছেন। সংগীতের মাধ্যমে তিনি মানুষকে শুনিয়েছেন ইতিবাচক জীবনবোধের কথা। অতুলপ্রসাদের গান, প্রকৃত অর্থেই, বাংলা সংগীতভুবনের অতুলনীয় সম্পদ।

তথ্যনির্দেশ

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *অতুলপ্রসাদ সেন,* বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১১

২. মানসী মুখোপাধ্যায়, *অতুলপ্রসাদ,* কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭১, পৃ. ১০, ১৩

৩. শিখা আরেফিন, 'অতুলপ্রসাদ সেন : জীবন ও সংগীত', *আইবিএস জার্নাল,* ৮ম সংখ্যা ১৪০৭, পৃ. ২১,২২

৪. কনক দাস, 'অতুলপ্রসাদের গান', *দেশ* বিনোদন ; সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ, কলিকাতা ১৩৯১, পৃ. ৫৯

৫. কনক দাস, পৃ. ৫৮-৬০

৬. দিলীপকুমার রায়, 'অতুল প্রসাদ ও তাঁর সংগীত' সৌমিত্র লাহিড়ী, কঙ্কণা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *বাংলা সংগীত মেলা স্মারক গ্রন্থ* ১৪০৫, ১৯৯৮, পৃ. ৭৬

৭. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান,* বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ. ১৮।